Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
UGC Enlisted Serial No. 48666
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 117-123
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আখতারুজ্জামানের গল্পভুবন : প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধ

তপন মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The struggle for freedom of 1971 of Bangladesh was tremendously nostalgic and heart-rending to the people specifically speaking Bengali language as their mother tongue. Some great writers, like Akhtaruzzaman, Hasan Azizul Huq, Taslima Nasrin and Humayun Ahamed thereupon composed their literary works keeping the socio-political, socio-cultural and even socio-economic atmosphere created at that time as the central background. Among them, Akhtaruzzaman Elias deserves special mention due to the fact that most of his compositions grew pinpointing the struggle for freedom of 1971 of Bangladesh. Among the several, 'Khoyabnama' and 'Chilekothar Sepai' were Akhtaruzzama's widely noted literary compositions that palpably bear the stream of nostalgisia that took form during the period of killing catastrophe in 1971.

The tragedy of 1971 and the bone-chilling facts of that time, and the delineation of all the crude realities were the central constituents of the thematic atmosphere of the short stories of Akhtaruzzaman. The stories such as 'Rain Coat', 'Jal Swapna, Swapner Jal' can be cited out as for distinguished examples. The story 'Rain Coat' is purely of that kind which elaborates with artistic perceptions the transition and transformation of a character from a week and war-frightened personality to a heroic one. The story 'Jal Swapna, Swapner Jal' relates to both the present-time and aftermath social decline and demoralization, socio-economic and socio-cultural collapse upto two decades of Bangladesh of 1971. In fine, it can be certainly pointed out that the stories aforementioned makes sensical picturization of Akhtaruzzaman's thoughtful consciousness about and contemplation on Bangladesh of 1971.

মূল প্রবন্ধ : মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)- বিষয়টি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে অতি স্পর্শকাতর একটা বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে বাংলা ভাষা যে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টি হল, এই যুদ্ধ বাংলাদেশী মানুষকে ভীষণ ভাবে নাড়িয়ে তুলেছিল। একটা ভাষার জোরে একটা জাতি বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হল। ভাষার জোরেই একটা দেশের নাম হল বাংলাদেশ। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া নৃশংস ও বর্বরতাযুক্ত হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। শুধু বাংলাদেশ কেন ভারত, নেপাল, ভুটান, জাতিপুঞ্জকেও সেই বর্বরতা হিম করে তুলেছিল। এরা প্রত্যেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বরতার উচ্চসীমা লক্ষ্য করেছিল। গণহত্যা, মন্দির-মসজিদ-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধুলিস্যাত করে দেওয়া, কয়েক লক্ষ

মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে এসেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত মুক্তিবাহিনীর প্রাণপণ চেষ্টা সেদিন ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হয়নি। এনেছিল মুক্তির স্বাদ। লেখক সেই মুক্তির স্বাদ যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি অঙ্গাররূপ দেশের দাউ দাউ আগুনও দেখেছেন। লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের ভীষণভাবে সমর্থন করতেন। লেখকের এক জীবনপঞ্জিতে লেখা হয়েছে—

> *'মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখছেন, বাড়িতে আশ্রয় দিচ্ছেন। এসময় কিছু প্রকাশ্য কিছু গোপন আড্ডাও হয়।'*[৩]

অর্থাৎ যুদ্ধের চরমও পরম আবহাওয়া তাঁকে স্পর্শ করেছিল। আর সেই আবহাওয়ার অনুকূলেই গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যজীবন। উপন্যাস-ছোটোগল্প-প্রবন্ধ সবশ্রেণির রচনাতেই তাঁর মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক মানসিকতার পরিচত পাওয়া যায়। তাঁর লেখনিতে কখনো উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ সমকালীন উত্তাল বাংলাদেশ, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাজাকারদের দালালী অপসংস্কারের ছবি। উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন দেশের চরম অর্থনৈতিক সংকট, বিচ্ছিন্ন সমাজ ব্যবস্থার নগ্ন প্রতিচ্ছবি। 'অতন্দ্র' গল্পে সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এরপর মানুষটিকে আর অতন্দ্রপ্রহর জেগে কাটাতে হয়নি। সুখ স্বপ্নের না হোক দুঃস্বপ্নের জাল বুনেছেন চিলেকোঠায়। চিলেকোঠার সেপাই হয়ে রচনা করেন 'খোয়াবনামা'। খোয়াবগুলিও তাঁর কাছে আজ 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' বলে মনে হয়েছে। তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্যপূর্ণ উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষমাত্রা পেয়েছে, সেটি হল মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গ গল্পগুলির মধ্যে 'রেইনকোট' ও 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্প দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবার নির্বাচিত গল্প দুটিকে অনুষঙ্গ করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পালা।

'রেইনকোট' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প। গল্পটিতে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। গঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী বা মিসক্রিয়েন্ট। এই দলেরই এক সদস্য মিন্টু। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল হুদা। নুরুল রসায়নের লেকচারার। একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ। এই ভয় মিলিটারির বারো ঘায়ের ভয়। গতরাতে কারা যেন কলেজের পাশের ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। মিলিটারির সন্দেহের তালিকায় রয়েছে নুরুলসহ আরও দু'জন। মিলিটারি কলেজে পৌঁছে গিয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপাল উচ্চ ডিগ্রিধারী হলেও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্র ভাবিত হয়নি। সন্দেহের তালিকা থেকে ডাক পড়ে রসায়নের লেকচারারের। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। তা সত্ত্বেও তাঁকে কলেজে পৌঁছতে হবে। নুরুলের স্ত্রী আসমা তখন স্বামীর গায়ে মুক্তিযোদ্ধা ভাই মিন্টুর ফেলে যাওয়া রেইনকোটটি চাপিয়ে দেয়। নুরুলের ছোট্ট মেয়েটি বলে ওঠে- 'আব্বু ছোটমামা হয়েছে, আব্বু ছোটমামা হয়েছে।' নুরুলের ছোটছেলেটিরও জিজ্ঞাস্য – 'আব্বুকে ছোটমামা মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তাহলে মুক্তিবাহিনী?' তাই না?' আয়নায় নিজের চেহারা দেখেও নুরুল চমকে যায়।

কলেজে পৌঁছলেই নানা কথার অছিলায় গ্রেফতার হয় নুরুল। চোখ বেঁধে একটা দূরে কোথাও ঘরে নিয়ে ছলে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন। তাকে জানানো হয় 'মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে প্রবেশ করেছিল কুলি ছদ্মবেশে, তারা ধরা পড়েছে, ধৃত সেই মিসক্রিয়েন্টরাই লেকচারার নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে হুদার নিয়মিত যোগাযোগের কথাও কবুল করেছে – সেও গ্যাঙের এক সক্রিয় সদস্য।' নুরুল তখন বলে ওঠে – 'আমার নাম? সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?' এরপর থেকে সে মিলিটারির অসহ্য অত্যাচার, লাঠির আঘাত হাসিমুখে সহ্য করে নেয়। সীমাহীন নির্যাতন তার কাছে 'মনেহয় স্রেফ উৎপাত'। অকপটে নুরুল তখন স্বীকার করে—

> *'শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়।'*

মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে তার উপর চলে অমানসিক নির্যাতন, অত্যাচার। অবশ্য তখন সেদিকে নুরুলের মনোযোগ থাকে না, যে তার উপর নির্যাতন চলছে, না অবিচার চলছে!

গল্পটি যে মুক্তিযুদ্ধের আবহে রচিত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। গল্পের প্রারম্ভে দেখা যায় গল্পের নায়ক নুরুল প্রচণ্ড ভীত ও সন্ত্রস্ত। এ ভয় ভূত বা প্রেতের ভয় নয়, এ ভয় মিলিটারির ভয়। দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হতেই নুরুলের মনে হয় 'মিলিটারি! মিলিটারি তার ঘরে। আল্লা গো।' এই মিলিটারি ১৯৭২-এর মুক্তিযুদ্ধের বন্ধুকবাজ মিলিটারি, নির্যাতনকারী মিলিটারি। ভীত-সন্ত্রস্ত এই মানুষটি শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে অসীম সাহসী, যেখানে তার আসন্ন মৃত্যুকেও সে উপেক্ষা করে গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে 'মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে।' গল্পটিতে মূলত সেই পরিবর্তনশীল মানুষটিকে দেখানো হয়েছে, যেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত একটি মানুষ স্বাদেশিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিকামী বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি হয়ে ওঠে। সমকালীন বাংলাদেশের জনমানসে এরূপ নীতিচেতনা জাগরূক হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে, দেশকে স্বাধীন করতে এটা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। যুদ্ধকালীন সময়ে আরেকটি শ্রেণির প্রতিনিধিও অপ্রতুল ছিলোনা, যারা মিলিটারির সঙ্গে সখ্যতা করেছে, তাদের দালালী করেছে, পরিচিত হয়েছে রাজাকার নামে। এই শ্রেণির মানুষজনই তখন বাংলার মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি ভয়ের ছিল। গল্পে কলেজের প্রিন্সিপাল ড. আফাজ আহমেদ সেই শ্রেণির প্রতিনিধি। 'পাকিস্তানের জন্যে প্রিনসিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। ...... এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিনসিপ্যাল মিলিটারির বড় কর্তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুল-কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এসব আনঅথরাইজড কনস্ট্রাকশন হলো হিন্দুর শিব লিঙ্গের সামিল, এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে।' এই দেশদ্রোহীদের জন্যই নুরুলের মতো, মিন্টুর মতো মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিটারির হাতে গুলি খেতে হয়। প্রিনসিপ্যালের বিশ্বাসঘাতকতায় কর্নেলের কাছে নুরুলের ডাক পড়ে। ভীত-সন্ত্রস্ত নুরুল যখনই কর্নেলের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবে তখন দেখা যায় বাইরে প্রচণ্ড দুর্যোগ বা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এই দুর্যোগ সমকালীন বাংলাদেশের বিপন্ন অবস্থার ইঙ্গিতকে ব্যঞ্জিত করে তোলে। ঘর থেকে বেরনোর পূর্বে নুরুলের স্ত্রী আসমা তখন মুক্তিযোদ্ধা ভাই মিন্টুর ফেলে যাওয়া একটি রেইনকোট নুরুলের গায়ে চাপিয়ে দেয়। গল্পের পট পরিবর্তনে এই কোটটিই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছে। রেইনকোটটি একজন মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট। কোটটি গায়ে চাপানোর পর থেকেই গল্পের নায়কের মধ্যে একটা আত্মিক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। সহসাই সে যেন সাধারণ নাগরিক থেকে মহানাগরিক মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে যেমন তার সন্তান-সন্ততি বুঝেছিল 'আব্বু, ছোটোমামা' হয়েছে, তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না নুরুল মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার প্রথম পর্বে পৌঁছে গেছে। কোটটা পরলে 'দেখতে একটু মিলিটারি মিলিটারি লাগছে'। যেখানে সে জানে 'মিলিটারির মতো দেখা নিরাপদ নয়', সেখানে প্রকারন্তরে সে সাহসের সঞ্চার ঘটায়। সে অনুভব করতে পারে- 'মিন্টুর ফেলে যাওয়া নাকি রেখে যাওয়া রেইনকোটে ঢোকার পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।' আত্মপ্রত্যয়ে প্রত্যয়ী নুরুল 'খামখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টি দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনা বোধ নাই?' এ যেন প্রকারন্তরে সাহসিকতার বীজ ধারণ, যা পরবর্তীকালে মহীরুহ আকারে দেখা দেবে। গল্প পাঠে অবশ্য আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাবো। মিলিটারি শব্দটি থেকেই যে মানুষটির মনে একটা ভীত-সন্ত্রস্ততার ভাব জাগ্রত হতো তা আজ প্রচ্ছন্ন। কারণ মুক্তিকামীরা মিলিটারিকে মোটেও ডরায় না বরং তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। গল্পে নুরুল সেই শ্রেণিরই প্রতিনিধি। কলেজে যাওয়ার সমস্ত পথ পরিক্রমায় নুরুল ভীতু হয়েই ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার কোট পড়ানোর পর থেকেই তার মধ্যে থেকে ভয় নির্লিপ্ত হতে থাকে। সেখানে আসে সাহসের জোয়ার। এক কথায় তার মানস মনে পরিবর্তন লক্ষণীয়। মিলিটারিরা যখন বলেছে- 'মিসক্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলি বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরাপড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।' মিলিটারি নিক্ষিপ্ত বাক্যবাণগুলি যেন নুরুলের

রোমকূপগুলিকে স্ফিত করে তোলে। তার শরীর যেন অধিকমাত্রায় অক্সিজেন পায়। ভয়কে দূরীভূত করে সে হয়ে ওঠে বিষম সাহসী। তার স্ফিত কণ্ঠে শোনা যায়- 'আমার নাম? সত্যি বলেছে? আমার নাম বলেছে?' ভয়কে দূরে সরিয়ে সে আজ জয়ী। এভাবেই সমকালীন পরিবর্তনশীল মানুষের একটি আদর্শ চরিত্র হয়ে ওঠে নুরুল। মিলিটারির জিজ্ঞাস্য 'ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে।' অসমসাহসিকতায় নুরুল জানায় 'হ্যাঁ'। অর্থাৎ তার চেতনার রূপান্তরে সে মুক্তিযুদ্ধের অংশীদারি হতে চায়। দেশোদ্ধারের মতো মহান কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা যে কতটা মহৎকার্য, তা সে যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিল। এই অনুভবেই তার শরীরে পড়া 'বিরতিহীন বাড়িগুলো' 'স্রেফ উৎপাত' ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। লেখক বিষয়টিকে একটি বাক্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন- 'রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে।' অর্থাৎ রেইনকোটটি গায়ে চাপানোয় যে রূপান্তর নায়কের মধ্যে শুরু হয়েছিল, তার শরীর থেকে কোটটি খুলে নেওয়ার পরও অনুভূত 'ওম'-এ সেই রূপান্তর পূর্ণবৃত্ত লাভ করে। এই পূর্ণবৃত্তের আদর্শায়িত রূপ ফুটে ওঠে নুরুলের গহীন অনুভূতিতে—

> *'বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালা নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার উপর তাদের আস্থাও কম নয়।'*

নিজেকে গৌরবান্বিত করার সুযোগটুকু নুরুল হাত ছাড়া করেনি। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত মুখী পরিবর্তনে সে আজ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই রূপান্তর, অনস্তিত্ত্ব থেকে অস্তিত্ত্বমান হয়ে ওঠার রূপান্তর অর্থাৎ নঞর্থক থেকে সদর্থকের দিকে চেতনার পরিবর্তন। একটু ভিন্নভাবে বললে, আখতারুজ্জামান সৃষ্ট একদা ভীতু রসায়নের লেকচারার নুরুল হুদা রেইনকোট গায়ে চাপিয়ে যেন চেতনার নবরূপায়নে বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পটি একাত্তরের (১৯৭১) মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী দুই দশক ব্যাপী বাংলাদেশের সময়কালের প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পে লালমিয়া এক লন্ড্রিওয়ালা। নাজির আলি নামে এক ধূর্ত লোকের লন্ড্রিতে সে কাজ করে। ইমামুদ্দিন নামে তার এক বন্ধু ছিল। ইমামুদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা। একদা গোলাবারুদসহ লড়ি ও মিলিটারির ঘাটি উড়িয়ে দিয়েছে সে। দেশকে স্বাধীন করাই তার একমাত্র স্বপ্ন। পরিবারে আম্মা, আব্বু, দাদা, দাদী, স্ত্রী, পুত্র সকলেই রয়েছে। তাদেরও স্বপ্ন ইমামুদ্দিন দেশে স্বাধীনতা আনবে। লালমিয়ার সঙ্গে ইমামুদ্দিনের স্কুল বয়সের সখ্যতা। এদিকে লালমিয়ার মনিব নাজির আলি ছিল রাজাকার, মিলিটারির দালাল। লালমিয়ার কাছে তাই রাজাকারদের বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী শুনিয়েছিল ইমামুদ্দিন- 'সমস্ত দেশ থেকে মিলিটারি নিশ্চিহ্ন করে তাদের দালাল ভাউরা যা আছে সবাইকে তারা একটি একটি করে সাফ করবে।' ভীত-সন্ত্রস্ত নাজির আলী তাই মিলিটারির সঙ্গে পরামর্শ করে ইমামুদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। ইমামুদ্দিনের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে যৎপরোনাস্তি অবস্থা করে ছাড়ে। জীবনে শুধু বেঁচে থাকে সন্তান বুলেট ও তার মা। বুলেট বড় হয়ে স্বপ্ন দেখে 'কাউলকা রাইতে ঐ শাহ্ সাহেব মুসল্লিরে দেখলাম। ......পাও দুইখানা তার ঠ্যাঙের লগে উলটা দিকে ফিট করা।' বুলেটের প্রশ্নে তারা রেগে গিয়ে যতই তারা তার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে, ততই তারা দূরে সরে যাচ্ছে। পিতার আদর্শে বড় হতে থাকলেও যেন বুলেট সেই আদর্শকে আর টিকিয়ে রাখতে পারে না।

একটা স্বপ্ন দেশকে শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করা, আরেকটা স্বপ্ন স্বাধীনতা অর্জনে বাঁধা প্রদান। এর মধ্যে দেশমাতৃকায় ব্রতী স্বপ্নটা যে প্রকৃত স্বপ্ন সে সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। গল্পে শুধু ইমামুদ্দিন নয়, তার বন্ধু লালমিয়া, ইমামুদ্দিনের মা, দাদা, দাদী, স্ত্রী, প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন। এইভাবেই প্রত্যেকটি

চরিত্র স্বপ্নের জাল বুনে চলে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পরিবার, পরিবারের সদস্য এইভাবেই স্বপ্ন দেখতো দেশটা কবে স্বাধীন হবে। ইমামুদ্দিনের পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের মতো বাংলার প্রতিটি পরিবারের চোখে-মুখে তখন আতঙ্কের ছায়া- এই বুঝি মিলিটারির গাড়ি ঢুকছে, সকলকে তুলে নিয়ে যাবে। বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেবে। অনেক প্রাণ বিসর্জন, নারীর সম্ভ্রম বিসর্জন, নিষ্পাপ শিশুর প্রাণের বিনিময়ে এসেছিল স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের দু'দশক কাটতে না কাটতেই স্বাধীনতার স্বাদ বিষাদে পরিণত হয়। দেশ স্বাধীন হলেও দেশে থেকে যাওয়া এক শ্রেণির স্বার্থপর, অর্থলোলুপ লুম্পেনের দল স্বপ্নকে বিষম স্বপ্নে পরিণত করে। দেশে দেখা যায় নাজির আলির মতো স্বার্থান্বেষী মানুষ। সুযোগ সন্ধানে তারা অন্যের দোকান, বাড়ি, ঘর, জায়গা গায়ের জোরে দখল করে নিজের নামাঙ্কিত করে নিচ্ছে। লেখক তাই লেখেন- 'ধনঞ্জয় সাহার কাপড়ের দোকানটাও হাতছাড়া হলো, কোন এম.পি. না কে সেখানে করল হার্ডওয়ারের দোকান।' অর্থাৎ একজনের দোকান অন্যজন দখল করে নিল। এইভাবে শুধু ধনঞ্জয় নয়, প্রভাবশালী মানুষেরা মাৎসান্যায়ের মতো ছোটো ছোটো মানুষগুলোকে গিলে গিলে খেয়েছে। ইমামুদ্দিন সমকালীন বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার মূর্ত প্রতীক, যাদের স্বপ্ন দেশকে স্বাধীন করা। স্বপ্ন সাকার করতে তার জীবনকেও উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে মৃত্যু কালবেলা পর্যন্ত। দৃঢ় প্রত্যয়ে তারা ঘোষণা করতে পিছু পা হয় না- 'পাকিস্তান আর বেশি দিন নাই। বহুত পোলাপান বর্ডার পার হইচে, ট্রেনিং লইয়া আইতাছে, হালার মিলিটারি আর কয়দিন? আমার গলে চল, বেশিদিন লাগবো না, আইয়া পড়ম। ল, যাই গিয়া।' একদিকে মুক্তিকামীতার স্বপ্ন, তো অন্যদিকে দেশ ধ্বংসকারী আত্মলোলুপতার স্বপ্ন। দুই স্বপ্নের সংঘর্ষ 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল'। নাজির আলির মতো রাজাকাররা সমস্ত স্বপ্নকে জাল স্বপ্নে পরিণত করায় সদা তৎপর। এজন্য মুক্তিকামীদের ধ্বংস করার আপ্রাণ প্রয়াস তাদের মধ্যে সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। গল্পে নাজির আলির মধ্যে এই ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইমামুদ্দিনের পরিবারের উপর মিলিটারি ছড়িয়ে দেওয়া, তাদের সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেওয়া সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তার ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। ইমামুদ্দিনের বউ মিলিটারির খপ্পরে পড়লে সে বিষয়ে নাজির আলির বক্তব্য পাশবতাকে অতিক্রম করে যায়—

> *'আমার দীনের জন্য হাজার মেইল দূরে থেকে মিলিটারি এসে জান কোরবান করে দিচ্ছে, তাদের শরীরে তো কিছু চাহিদা থাকে। সেটুকু মেটাতে না পারলে নিমকহারামি করা হয় না?'*

এইভাবেই আসমার মতো সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে বাংলার মা-বোনকে। এই শ্রেণির পাশবতার মধ্যে দিয়েই আসে স্বাধীনতা। লেখক তারই ইঙ্গিত দেন- 'ঐ বছরের শেষে শীতের ভেতর কুয়াশায় রোদ জ্বালিয়ে পাড়ার ছেলেরা ফেরে।' এ এক আনন্দের আবহ। বাংলার আকাশ বাতাস যেন আনন্দে মুখোরিত। সময়তা স্বপ্ন বাস্তবতার এক আদর্শ মেলবন্ধন। ঠিক এই সময়টিতেই সেই স্বার্থান্বেষীদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। গল্পেও ঠিক দেখা যায়, 'নাজির আলি যে কোথায় সটকে পড়ল কেউ কোনো হদিস পায় না।' গিরগিটির মতো রঙ বদল করে এইভাবেই সুযোগসন্ধানীর দল সটকে পড়ে। কিন্তু সুযোগ পেলে তারা পুনরায় রং ধারণ করে স্বমহিমায় অবতীর্ণ হয়। তাদের পুনরুত্থানে দেশ যেন পুনরায় স্বাধীনতা হৃত সর্বস্ব হয়। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এলো, তাও ধরে রাখা গেলো না। পরবর্তী দুই দশকেই এই অবস্থার শোচনীয় পরিণাম ঘটে। ব্যর্থ হয় স্বাধীনতা। গল্পেও তাই দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত কাল পরেই নাজির আলির মতো মানুষ দ্বারা গঠিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি পুনর্বাসিত ও শক্তিশালী হয়। কিভাবে তারা ডালপালা বিস্তার করে বাংলাদেশের মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে বস্তুত সেটিই এই গল্পের উপজীব্য।

রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে হঠাৎ নাজির আলির উদয় ঘটে। ভণ্ডামির মুখোশের আড়ালে সহজেই মানুষের মন জয় করে নেয় সে। গল্পে দেখা যায়, 'জুম্মার নামাজের পর মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে মুসল্লিদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে সালাম করে। ...... তার জীবনে এখন অপার শান্তি, মানুষের দোয়া ছাড়া আর

কিছুই তার কাম্য নয়। দোয়া পাওয়ার জন্য বাঁচতে হলে কিছু করতে হবে বলে বায়তুল মোকারমে সে সামান্য একটা সোনার দোকান করেছে।’ প্রাক্-স্বাধীনতার কালে যে ছিল সামান্য লন্ড্রির মালিক, স্বাধীনোত্তর কালে সে পরিণত হয় সোনার দোকানের মালিকে! কিভাবে যে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তা আশাকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। এই সুযোগসন্ধানী মানুষদের কৃত্রিমতা সর্বোচ্চ বিন্দু স্পর্শ করে তখন, যখন লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন—

> *‘নাজির আলির বাড়ি দখল করা বাড়ি যে শহিদ ইমামুদ্দিনের পরিবারের*
> *নামে বরাদ্দ করা হয়েছে এই কথা শুনে নাজির আলি মিষ্টি করে হাসে-*
> *ঠিক আছে ওরা আছে, তা থাক, বাড়িঘর নিয়ে তো আর কেউ যাবে না।*
> *ইমামুদ্দিনের মা মুসলমানের বেওয়া, ইমামুদ্দিনের ছেলে মুসলমানের এতিম।*
> *যতদিন খুশি এরা ঐ বাড়িতে বাস করুক, এদের জন্য কিছু করতে পারলে*
> *তো সে কৃতার্থ।’*

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এই ‘মিষ্টি করে হাসি’ আর ‘কৃতার্থ’ বোধের মধ্যে কতটা অসাধুতা লুকিয়ে রয়েছে। এই শ্রেণির মানুষের জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশ পুনরায় শোচনীয় বাংলাদেশে পরিণত হয়। যেখানে মুক্তিকামীদের সন্তানরা পর্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে পারেনি। যেটা পারেনি ইমামুদ্দিনের সন্তান বুলেটও। জন্মের পর থেকে যে বুলেট দাদী ও চাচা লালমিয়ার কাছে থেকে তার পিতার স্বপ্ন তথা দেশবাসীর স্বপ্ন মুক্ত বাংলাদেশের কথা শুনে বড় হয়েছে, তার জীবনও আজ বিপন্ন। একদিকে দেশের অর্থনৈতিক সংকট তো অন্যদিকে দাল্লাবাজদের রমরমা- দু’য়ে মিলে বুলেটের মতো পরবর্তী প্রজন্ম জননী-যন্ত্রণায় জর্জরিত। প্রাক্-স্বাধীনতা, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনোত্তর সময়কাল- এই তিন সময়কালের একমাত্র সাক্ষী লালমিয়ার মতো সহানুভূতি প্রবণ মানুষেরা। লালমিয়া এই তিনটি সময়র অভিজ্ঞতায় স্বপ্ন দেখে- ‘নমাজে আমার বগলে বইসা নমাজ পড়ে এক বুজর্গ শাহ্ সাহেব। বহুত খাবসুরৎ। মাগর তার পাও দুইখান দেখলাম উল্টা দিকে, মানে পাওয়ের পাতাগুলি ....।’ লালমিয়ার স্বপ্নের সঙ্গে বুলেটের স্বপ্নও যেন একাত্মতা পায়। এমতাবস্তায় নতুন করে বুলেটের চোখে আর স্বপ্ন দানা বাঁধে না। লেখকও তাই লেখেন- ‘লালমিয়া এবং বুলেটের স্বপ্নের চেনা লোকটি বসেছে বড়ো একটা চেয়ারে। তার সাদা দাঁড়ি প্রবাহিত হয় দুধের নহরের মতো, নহরের দুধে তার দামি আলখাল্লা একটু ঘিয়ে সাদা। লোকটির আলখাল্লার নিচে পায়ের পাতা দুটো রোজকার মতোই ঠ্যাঙের উল্টো দিকে লাগানো।’ নতুন দিনের যাত্রী বুলেট উৎসুক্য মনে জিজ্ঞাসা করে- ‘আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেলো, আপনেরা আপনাগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?’ এই কথা শুনে তারা রেগে বুলেটের দিকে এগিয়ে যায়। ‘কিন্তু পায়ের পাতা তাদের পেছনের দিকে থাকায় তারা যতই হাঁটে বুলেটের কাছ থেকে ততই সরে সরে যায়।’ বলতে দ্বিধা নেই, এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক একটা ইঙ্গিত্ময়তার পরিচয় দিয়েছে। স্বাধীনতা যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। উল্টোদিকে ‘পায়ের পাতা’ তারই ইঙ্গিতবাহি। দেশ স্বাধীন কালে যে সমস্ত পথ প্রদর্শকেরা ছিলেন তারা আজ অন্তর্হিত। স্বপ্নে তাদের দেখা পাওয়া গেলেও তারা আজ পরশের বাইরে। শত চেষ্টা করেও তারা এই সময়কালকে সংশোধনের কোনো মার্গ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই সততই তারা পশ্চাদগামী হচ্ছেন। সীমাহীন রক্তক্ষয়, নারী সম্ভ্রম বিসর্জনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা এসেছিল, সামান্য দু’দশক যেতে না যেতেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আলোচ্য গল্পটি গল্পকারের সেই আক্ষেপেরই এক বড় নিদর্শন। শুধু লেখক কেন যেকোনো বাংলাদেশীর কাছেই তা আক্ষেপের, লেখক তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মাত্র।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্রে রাখলে আমরা তিনটি সময়কে পাই- প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ কাল, মুক্তিযুদ্ধ সময়কাল ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর কাল। আখতারুজ্জামানের দুটি গল্পে আমরা এই তিনটি সময়কালকেই প্রত্যক্ষ করেছি। লেখক এই তিনটি সময় পর্বকেই খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, অনুভব করেছিলেন। এজন্যই মাত্র

দুটি গল্পেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের তিন ধরনের সময়কালকে নিষ্ঠুর হলেও সহজেই জানতে সক্ষম হয়েছি। এই ধরনের সাফল্য কেবলমাত্র একজন শীর্ষস্থানীয় লেখকের পক্ষেই সম্ভব- যা আখতারুজ্জামান করে দেখিয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ:

১) আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের নির্বাচিত ছোটগল্প, সম্পাদক : আলাউদ্দিন মণ্ডল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা- ২২৭